জাতিসংঘ ঘোষিত নির্যাতিতদের সমর্থনে আন্তর্জাতিক দিবস

বাংলাদেশে নির্যাতিতদের নিরাপত্তার পথে বাঁধা দূর করতে হবে

৯ মে ২০০৬, জাতিসংঘের নতুন মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়েছে, যা- বর্তমানে জেনেভাতে প্রথমবারের মত অধিবেশনে মিলিত হচ্ছে। নির্বাচনের পূর্বে সরকারের স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে দৃঢ়তার সাথে তারা বলেছেন, "সকল নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়ন করতে গভীর অঙ্গীকারাবদ্ধ।" বাংলাদেশ আরো দাবি করেছে যে, "জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল প্রকার মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়ণে অগ্রণী ভুমিকা পালন করবে। অধিকাংশ মানবাধিকার বিষয়ক সনদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বাংলাদেশ সেটি প্রতিধ্বনিতও করেছে।"

নির্যাতিতদের সমর্থনে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দিবস এর পূর্বে এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (কমিশন) উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, বাংলাদেশ অবধারিতভাবে এটাই নিশ্চিত করছে যেন নির্যাতিত মানুষের আইনগত প্রতিকার বা নিরাপত্তা প্রার্থনার উপযোগী কোন পথ খোলা নেই। জাতিসংঘের নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি বিষয়ক কনভেনশনে (সিএটি) অন্তর্ভুক্তির বশের সময় বাংলাদেশ ঘোষণা করে যে, সে "দেশের বিরাজমান আইন ও বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে ১৪ অনুচ্ছেদের ১ উপধারা প্রয়োগ করবে।" ১৪ অনুচ্ছেদের ১ উপধারা অনুযায়ী "প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র নিজ দেশের আইনগত প্রক্রিয়ায় নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ও তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রতিকার প্রাপ্তি এবং ন্যায্য ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের একটি প্রয়োগযোগ্য অধিকার যেখানে যতটা পরিপূর্ণ সম্ভব ততটা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।" জার্মানী সরকার, সেসময়, এই ঘোষণাকে উদ্বেগের সাথে আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, "একটি সাধারণ বিষয়ে রিজার্ভেশন আরোপ," এবং যা "কনভেনশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'র প্রতি বাংলাদেশের পূর্ণ অঙ্গীকারের প্রতি সন্দেহের অবকাশ রয়ে যায়।" একইভাবে, সংশ্লিষ্ট রির্জাভেশনটি "কনভেনশনের অধীনে রিজার্ভেশন আরোপকারী রাষ্ট্রের জাতীয় আইন প্রণয়নের আহবানের মাধ্যমে তার দায়িত্বসমূহের সীমা নির্দেশ করে;" একথা বলে নেদারল্যান্ড সরকার কনভেনশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'র প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল।

অভ্যন্তরীন আইন-কানুন স্পষ্টভাবে নির্যাতিতদের অধিকারের পরিপন্থী এবং নির্যাতনকারীদের 'ক্ষমা' (ইমপিউনিটি) নিশ্চিত করার যথার্থ ব্যবস্থা। সংবিধানের ৩৫ (৫) ধারায় নির্যাতনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ নির্যাতন বিরোধী কনভেনশন (সিএটি) এর অন্তর্ভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও, 'নির্যাতন'কে 'অপরাধ' গণ্য করে কোন অভ্যন্তরীন আইন নেই। যাই হোক, 'ক্ষমা করা'র বিধান ফৌজদারী কার্যবিধি'র ১৩২ ও ১৯৭ ধারায় সংরক্ষিত আছে, যা- আইনগতভাবে পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীসহ সরকারী কর্মচারীদের, কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত অবস্থায় কৃত যে কোন অপরাধের বা অপরাধসমূহের বিচারের পূর্বে আদালতকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমতি গ্রহনের নির্দেশ দেয়। অধিকন্তু, সরকার এধরনের অপরাধ বা অপরাধসমূহের কোন্‌টির তদন্ত হবে বা আদালতের মুখোমুখী করে বিচার করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে থাকে। তাছাড়া, ২০০২ সালের শেষদিকে কুখ্যাত 'অপারেশন ক্লীন হার্ট' চলাকালে যখন ৫৮ জন মানুষ নির্যাতনে প্রাণ হারায় এবং ১১ হাজারেরও অধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও 'ইন্ডেমনিটি এ্যাক্ট-২০০৩' প্রয়োগ করে ২০০২ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে ২০০৩ সালের ৯ জানুয়ারী পর্যন্ত সময়ে সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী'র সকল কৃতকর্ম থেকে পরিপূর্ণ দায়মুক্ত করা হয়েছে। এধরণের পদক্ষেপ, যা দেশটির দায়মুক্তি'র সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাখ্যা দেয়, বিলোপ করে নির্যাতনকারীদের বিচারের পথের বাঁধাগুলোকে এবং অসম্ভবরূপে তা বাড়িয়েও দেয়। ফলশ্রুতিতে, নির্যাতিতদের জন্য প্রতিকার প্রার্থনার সকল পথ বন্ধ হয়। বস্তুত, এমন প্রক্রিয়ার মাঝে নির্যাতিত মানুষের জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করার চেয়ে বরং নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়ের অভিযোগ জানানোর চেষ্টা করাও তাদেরকে প্রকৃত অর্থে বাড়তি বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করে। যার সাথে থাকে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে হুমকি, প্রতিহিংষা এবং পূনরায় নির্যাতনের শিকার হওয়া সহ সকল প্রকার প্রচলিত প্রতিঘাতের সম্ভাবনা।

এএইচআরসি'র অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বাস্তবে উপরে উল্লেখিত 'সিএটি'র উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে নির্যাতিত মানুষকে চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা থেকে বাংলাদেশ তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সাম্প্রতিক এক ঘটনায় দেখা যায়, শাহীন সুলতানা শান্তা নামে সন্তানের অপেক্ষায় পথে অপেক্ষারত অন্তঃসত্ত্বা নারীকে ২০০৬ এর মার্চ মাসে পুলিশী নির্যাতনের ফলে তার গর্ভের সন্তানকে পর্যন্ত হারাতে হয়েছে। নির্যাতনকারী পুলিশের কর্মকর্তা-সদস্যদের বিরুদ্ধে ঢাকার মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ তার মামলাটি পর্যন্ত গ্রহন না করে বারংবার প্রত্যাখ্যান করেছে। ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে 'দন্ডবিধি' এবং 'নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে' দু'টি মামলা দায়ের করা হয়, বিচারকের আদেশে যার মাধ্যে একটির 'বিচার বিভাগীয় তদন্ত' করা হলেও তদন্ত প্রতিবেদনটি অপূর্ণাঙ্গ হওয়ায় বিচারক 'অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন' দাখিল করতে নির্দেশ দেন।

তদন্ত প্রতিবেদনে শান্তাকে 'মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা হয়েছে- যার প্রয়োজন ছিল না; - - প্রকৃত অপরাধ পুলিশের এহেন কার্য দন্ডবিধির আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ;" একথা নিশ্চিত করা সত্ত্বেও 'অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন' আদালতে দাখিল করার পর বিচারক, কানিজ ফাতেমা নাসরিনা খানম, মামলাটি খারিজ করে দিলেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে এও বলা হয়েছে যে, "ফৌজদারী

কার্যবিধি'র ১৩২ ধারার বিধান মতে এই ঘটনাটির অপরাধ আমলে নেবার জন্য সরকারের পূর্বানুমতির প্রয়োজন রয়েছে।" অভিযোগ অনুযায়ী এটা ভেবে নেওয়াই যেতে পারে যে, বিচারকের উপর অত্যধিক চাপের প্রেক্ষিতে নারী নির্যাতন আইনের ধারায় 'অপর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের' অজুহাতে সম্পূর্ন মামলাটিই খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। দন্ডবিধি'র আওতাভুক্ত নির্যাতনের অভিযোগগুলোর সপক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অপপ্রয়োগের সমস্যায় জর্জরিত হওয়ার কারণে দেশের দূর্নীতিগ্রস্ত অধঃস্তন বিচারালয়ে মামলাটি খারিজ হয়ে গেল। তদন্ত চলাকালীন সময়ে শান্তা, তার আইনজীবী স্বামী, এবং স্বাক্ষীদেরকে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন, এমনকি মিথ্যা মামলায় পুলিশী হয়রাণীও করা হয়। শান্তা'র স্বামী আতিউর রহমানকে তিন সপ্তাহের মধ্যে দুই বার অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা ধাওয়া করে পথ রোধ করে পরিচয় জানতে চেয়ে আক্রমণ করেছে। এমনকি, শান্তার নির্যাতনজনীত জখমের মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদানকারী ডাক্তারকেও পর্যন্ত হুমকি দেওয়া হয়েছে। এটা হল অগণিত উদাহরণের মধ্য থেকে মাত্র একটি।

নির্যাতন সারা বাংলাদেশে একটি মহামারী। এর ব্যপকতাকে কয়েকটি 'নষ্ট আপেলে'র বর্ণনার মত করে বলে বোঝানো যাবে না। বরং এটি অপপ্রয়োগের এমনই এক প্রক্রিয়াভুক্ত হয়েছে যে, অপ্রতিরোধ্য দূর্নীতি- যার ফলে রাষ্ট্রীয় আইনের শাসনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান- তথা পুলিশ, অপরাপর আইন প্রয়োগকারী বাহিনী, বিচার বিভাগ ও তদন্ত পরিচালনা বিভাগ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে; যার সবকিছুই দেশের ক্ষমতাসীন ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বারা নিস্পেষিত হচ্ছে।

পুলিশ তাদের প্রতিটি কার্যক্রম থেকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে অনৈতিভাবে আর্থিক সুবিধা গ্রহন করে। দূর্নীতি, রাজনীতিকরণ ও বৈষম্য প্রতিটি পদে পদে শুরু থেকেই বিদ্যমান। একজন মানুষ অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে তাকে অর্থ ব্যয় করতে হবে; থাকতে হবে সঠিক রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা অথবা তার অভিযোগটি যথাযথভাবে অগ্রগামী করতে হলে যোগাযোগ থাকতে হবে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে। যদি অভিযুক্ত অপরাধীরা পুলিশ বাহিনীর অংশ হয় বা তাদের রাজনৈতিক সহযোগী হয়, তাহলে অভিযোগের বিপরীতে তার ভাগ্যে প্রচলিত চর্চা অনুযায়ী জুটবে হুমকি ও অন্যান্য অপপ্রয়োগ। অভিযোগটি নির্যাতন সংক্রান্ত হলে এটা ঘটবে।

যখন কারো অভিযোগ গ্রহনও করা হয়, সেক্ষেত্রে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের পর্বটি নিজেদের অর্থ উপার্জনের উপলক্ষ হিসেবে উদযাপন করবে। তদন্তের মুখোমুখি হওয়া মানুষ নিজেকে চার্জ শীট থেকে বাঁচাতে বা হয়রানীমূলক মিথ্যা অভিযোগের মামলা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বা নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাধ্য হয়েই পুলিশকে অর্থ দিতে হবে।

বাংলাদেশের পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে 'নির্যাতন' ব্যপকভাবে 'থার্ড ডিগ্রী মেথড' হিসেবে অভিহিত। প্রত্যাশিত 'পাওনা' ঠিকমত পাওয়া না গেলে তদন্তকারী কর্মকর্তা বহুল প্রচলিত হিংশ্র নির্যাতনের হরেক রকম সংমিশ্রন ঘটিয়ে এই 'থার্ড ডিগ্রী মেথড' প্রয়োগ করবে, যা- লোকটির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। এই 'মেথড' এর মধ্যে নির্যাতনের অসংখ্য নির্মম পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল, লাঠি বা ভোতা কিছু দিয়ে পায়ের তলায় ও শরীরের স্পর্শকাতর অংশে আঘাত করা; বুট পায়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাড়ানো; শীত ও গ্রীষ্মকালে মরিচের গুড়া মিশিয়ে যথাক্রমে ঠান্ডা ও গরম পানি নাকে-মুখে ঢেলে দেওয়া; বৈদ্যুতিক শক দেওয়া; আঙুলের নখ উপড়ে ফেলা; সূঁচ বা কাঁটা ফোঁটানো; যৌন পীড়ন চালানো প্রভৃতি। জোর পূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়, শাস্তি দেওয়া, অর্থ আদায় এবং উর্ধতন কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করতে এই 'থার্ড ডিগ্রী মেথড' ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশ বর্তমানে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হলেও নির্যাতিত মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া তথা চরম মানবাধিকার লংঘন প্রতিকারে ও প্রতিরোধে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। কাউন্সিলে গ্রহনযোগ্যতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে জরুরী ভিত্তিতে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে হবে নতুবা এ পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। আসন্ন মাসগুলোতে দেশটিতে নির্যাতিতদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষমতার বিষয়ঃ যেমন, নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনের ১৪ এর ১ অনুচ্ছেদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা (রিজার্ভেশন) প্রত্যাহার করা; নির্যাতন স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা; 'নির্যাতন'কে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পন্থায় 'অপরাধ' হিসেবে গণ্য করে আইন কার্যকর করা; কোন সময় ক্ষেপণ না করে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক দপ্তর কর্তৃক নির্যাতন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন; ইনডেমনিটি এ্যাক্ট-২০০৩ এবং ফৌজদারী কার্যবিধি'র ১৩২ ও ১৯৭ ধারা সহ রাষ্ট্রীয় নির্যাতনকারীদের দায়মুক্তি দেওয়ার আইনগুলো বাতিল করা; দূর্নীতির সকল অভিযোগের তদন্ত ও বিচার করা; নির্যাতিত মানুষকে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া; আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানের সাথে সঙ্গতি রেখে সকল অভিযুক্ত নির্যাতনকারীকে স্বাধীন ও কার্যকর তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার নিশ্চিত করা; এবং নির্যাতিত মানুষ ও সাক্ষীদের কার্যকর নিরাপত্তা দেওয়া, প্রভৃতি কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে মুল্যায়ণ করতে হবে।

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন বাংলাদেশে নির্যাতিতদের নিরাপত্তা প্রদানে সব ধরণের অপপ্রয়োগ এবং নির্যাতনের সংস্কৃতির প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং সরকারকে তার এ বিষয়ক অঙ্গীকারসমূহ স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য, বিশেষ করে উপরের সুপারিশগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে গ্রহনযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের আহবান জানাচ্ছে। এতে সরকারের তরফ থেকে ব্যর্থতা তাদের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিন্দা এবং মানবাধিকার কাউন্সিল থেকে বহিস্কারের ব্যবস্থাই শুধু করবে। নির্যাতিতদের সমর্থনে জাতিসংঘভুক্ত সদস্যরা ঘটা করে শুধুই একটি দিবস উদযাপনের বাইরে যদি গ্রহনযোগ্য কিছু করতেই চায়, তবে চরম এই অমানবিক মৌলিক ও মানবাধিকার লংঘনের সত্যিকার প্রতিকারের কঠোর পদক্ষেপ নিতেই হবে।

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (এএইচআরসি) এর বিবৃতি

নির্যাতিতদের সমর্থনে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দিবসঃ
নির্যাতিতদের নিরাপত্তার পথে বাঁধা দূরীকরনের জন্য বাংলাদেশের প্রতি আহবান।

৯ মে ২০০৬, জাতিসংঘের নতুন মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়েছে, যা- বর্তমানে জেনেভাতে প্রথমবারের মত অধিবেশনে মিলিত হচ্ছে। নির্বাচনের পূর্বে সরকারের স্বতঃস্ফুর্ত অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে দৃঢ়তার সাথে তারা বলেছেন, "সকল নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়ন করতে গভীর অঙ্গীকারাবদ্ধ।" বাংলাদেশ আরো দাবি করেছে যে, "জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল প্রকার মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়ণে অগ্রণী ভুমিকা পালন করবে। অধিকাংশ মানবাধিকার বিষয়ক সনদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বাংলাদেশ সেটি প্রতিধ্বনিতও করেছে।"

নির্যাতিতদের সমর্থনে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দিবস এর পূর্বে এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (কমিশন) উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, বাংলাদেশ অবধারিতভাবে এটাই নিশ্চিত করছে যেন নির্যাতিত মানুষের আইনগত প্রতিকার বা নিরাপত্তা প্রার্থনার উপযোগী কোন পথ খোলা নেই। জাতিসংঘের নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি বিষয়ক কনভেনশনে (সিএটি) অন্তর্ভুক্তির বশের সময় বাংলাদেশ ঘোষণা করে যে, সে "দেশের বিরাজমান আইন ও বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে ১৪ অনুচ্ছেদের ১ উপধারা প্রয়োগ করবে।" ১৪ অনুচ্ছেদের ১ উপধারা অনুযায়ী "প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র নিজ দেশের আইনগত প্রক্রিয়ায় নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি ও তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রতিকার প্রাপ্তি এবং ন্যায্য ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের একটি প্রয়োগযোগ্য অধিকার যেখানে যতটা পরিপূর্ণ সম্ভব ততটা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।" জার্মানী সরকার, সেসময়, এই ঘোষণাকে উদ্বেগের সাথে আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, "একটি সাধারণ বিষয়ে রিজার্ভেশন আরোপ," এবং যা "কনভেনশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'র প্রতি বাংলাদেশের পূর্ণ অঙ্গীকারের প্রতি সন্দেহের অবকাশ রয়ে যায়।" একইভাবে, সংশ্লিষ্ট রির্জাভেশনটি "কনভেনশনের অধীনে রিজার্ভেশন আরোপকারী রাষ্ট্রের জাতীয় আইন প্রণয়নের আহবানের মাধ্যমে তার দায়িত্বসমূহের সীমা নির্দেশ করে;" একথা বলে নেদারল্যান্ড সরকার কনভেনশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'র প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল।

অভ্যন্তরীন আইন-কানুন স্পষ্টভাবে নির্যাতিতদের অধিকারের পরিপন্থী এবং নির্যাতনকারীদের 'ক্ষমা' (ইমপিউনিটি) নিশ্চিত করার যথার্থ ব্যবস্থা। সংবিধানের ৩৫ (৫) ধারায় নির্যাতনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ নির্যাতন বিরোধী কনভেনশন (সিএটি) এর অন্তর্ভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও, 'নির্যাতন'কে 'অপরাধ' গণ্য করে কোন অভ্যন্তরীন আইন নেই। যাই হোক, 'ক্ষমা করা'র বিধান ফৌজদারী কার্যবিধি'র ১৩২ ও ১৯৭ ধারায় সংরক্ষিত আছে, যা- আইনগতভাবে পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীসহ সরকারী কর্মচারীদের, কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত অবস্থায় কৃত যে কোন অপরাধের বা অপরাধসমূহের বিচারের পূর্বে আদালতকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমতি গ্রহনের নির্দেশ দেয়। অধিকন্তু, সরকার এধরনের অপরাধ বা অপরাধসমূহের কোন্‌টির তদন্ত হবে বা আদালতের মুখোমুখী করে বিচার করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে থাকে। তাছাড়া, ২০০২ সালের শেষদিকে কুখ্যাত 'অপারেশন ক্লীন হার্ট' চলাকালে যখন ৫৮ জন মানুষ নির্যাতনে প্রাণ হারায় এবং ১১ হাজারেরও অধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও 'ইন্ডেমনিটি এ্যাক্ট-২০০৩' প্রয়োগ করে ২০০২ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে ২০০৩ সালের ৯ জানুয়ারী পর্যন্ত সময়ে সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী'র সকল কৃতকর্ম থেকে পরিপূর্ণ দায়মুক্ত করা হয়েছে। এধরণের পদক্ষেপ, যা দেশটির দায়মুক্তি'র সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাখ্যা দেয়, বিলোপ করে নির্যাতনকারীদের বিচারের পথের বাঁধাগুলোকে এবং অসম্ভবরূপে তা বাড়িয়েও দেয়। ফলশ্রুতিতে, নির্যাতিতদের জন্য প্রতিকার প্রার্থনার সকল পথ বন্ধ হয়। বস্তুত, এমন প্রক্রিয়ার মাঝে নির্যাতিত মানুষের জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করার চেয়ে বরং নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়ের অভিযোগ জানানোর চেষ্টা করাও তাদেরকে প্রকৃত অর্থে বাড়তি বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করে। যার সাথে থাকে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে হুমকি, প্রতিহিংষা এবং পূনরায় নির্যাতনের শিকার হওয়া সহ সকল প্রকার প্রচলিত প্রতিঘাতের সম্ভাবনা।

এএইচআরসি'র অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বাস্তবে উপরে উল্লেখিত 'সিএটি'র উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে নির্যাতিত মানুষকে চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা থেকে বাংলাদেশ তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সাম্প্রতিক এক ঘটনায় দেখা যায়, শাহীন সুলতানা শান্তা নামে সন্তানের

অপেক্ষায় পথে অপেক্ষারত অন্তঃসত্ত্বা নারীকে ২০০৬ এর মার্চ মাসে পুলিশী নির্যাতনের ফলে তার গর্ভের সন্তানকে পর্যন্ত হারাতে হয়েছে। নির্যাতনকারী পুলিশের কর্মকর্তা-সদস্যদের বিরুদ্ধে ঢাকার মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ তার মামলাটি পর্যন্ত গ্রহন না করে বারংবার প্রত্যাখ্যান করেছে। ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে 'দন্ডবিধি' এবং 'নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে' দু'টি মামলা দায়ের করা হয়, বিচারকের আদেশে যার মাধ্যে একটির 'বিচার বিভাগীয় তদন্ত' করা হলেও তদন্ত প্রতিবেদনটি অপূর্ণাঙ্গ হওয়ায় বিচারক 'অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন' দাখিল করতে নির্দেশ দেন।

তদন্ত প্রতিবেদনে শান্তাকে 'মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা হয়েছে- যার প্রয়োজন ছিল না; - - প্রকৃত অপরাধ পুলিশের এহেন কার্য দন্ডবিধির আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ;" একথা নিশ্চিত করা সত্ত্বেও 'অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন' আদালতে দাখিল করার পর বিচারক, কানিজ ফাতেমা নাসরিনা খানম, মামলাটি খারিজ করে দিলেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে এও বলা হয়েছে যে, "ফৌজদারী কার্যবিধি'র ১৩২ ধারার বিধান মতে এই ঘটনাটির অপরাধ আমলে নেবার জন্য সরকারের পূর্বানুমতির প্রয়োজন রয়েছে।" অভিযোগ অনুযায়ী এটা ভেবে নেওয়াই যেতে পারে যে, বিচারকের উপর অত্যধিক চাপের প্রেক্ষিতে নারী নির্যাতন আইনের ধারায় 'অপর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের' অজুহাতে সম্পূর্ন মামলাটিই খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। দন্ডবিধি'র আওতাভুক্ত নির্যাতনের অভিযোগগুলোর সপক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অপপ্রয়োগের সমস্যায় জর্জরিত হওয়ার কারণে দেশের দূর্নীতিগ্রস্ত অধঃস্তন বিচারালয়ে মামলাটি খারিজ হয়ে গেল। তদন্ত চলাকালীন সময়ে শান্তা, তার আইনজীবী স্বামী, এবং স্বাক্ষীদেরকে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন, এমনকি মিথ্যা মামলায় পুলিশী হয়রাণীও করা হয়। শান্তা'র স্বামী আতিউর রহমানকে তিন সপ্তাহের মধ্যে দুই বার অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা ধাওয়া করে পথ রোধ করে পরিচয় জানতে চেয়ে আক্রমণ করেছে। এমনকি, শান্তার নির্যাতনজনীত জখমের মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদানকারী ডাক্তারকেও পর্যন্ত হুমকি দেওয়া হয়েছে। এটা হল অগণিত উদাহরণের মধ্য থেকে মাত্র একটি।

নির্যাতন সারা বাংলাদেশে একটি মহামারী। এর ব্যপকতাকে কয়েকটি 'নষ্ট আপেলে'র বর্ণনার মত করে বলে বোঝানো যাবে না। বরং এটি অপপ্রয়োগের এমনই এক প্রক্রিয়াভুক্ত হয়েছে যে, অপ্রতিরোধ্য দূর্নীতি- যার ফলে রাষ্ট্রীয় আইনের শাসনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান- তথা পুলিশ, অপরাপর আইন প্রয়োগকারী বাহিনী, বিচার বিভাগ ও তদন্ত পরিচালনা বিভাগ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে; যার সবকিছুই দেশের ক্ষমতাসীন ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বারা নিস্পেষিত হচ্ছে।

পুলিশ তাদের প্রতিটি কার্যক্রম থেকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে অনৈতিভাবে আর্থিক সুবিধা গ্রহন করে। দূর্নীতি, রাজনীতিকরণ ও বৈষম্য প্রতিটি পদে পদে শুরু থেকেই বিদ্যমান। একজন মানুষ অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে তাকে অর্থ ব্যয় করতে হবে; থাকতে হবে সঠিক রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা অথবা তার অভিযোগটি যথাযথভাবে অগ্রগামী করতে হলে যোগাযোগ থাকতে হবে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে। যদি অভিযুক্ত অপরাধীরা পুলিশ বাহিনীর অংশ হয় বা তাদের রাজনৈতিক সহযোগী হয়, তাহলে অভিযোগের বিপরীতে তার ভাগ্যে প্রচলিত চর্চা অনুযায়ী জুটবে হুমকি ও অন্যান্য অপপ্রয়োগ। অভিযোগটি নির্যাতন সংক্রান্ত হলে এটা ঘটবে।

যখন কারো অভিযোগ গ্রহনও করা হয়, সেক্ষেত্রে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের পর্বটি নিজেদের অর্থ উপার্জনের উপলক্ষ হিসেবে উদযাপন করবে। তদন্তের মুখোমুখি হওয়া মানুষ নিজেকে চার্জ শীট থেকে বাঁচাতে বা হয়রানীমূলক মিথ্যা অভিযোগের মামলা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বা নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাধ্য হয়েই পুলিশকে অর্থ দিতে হবে।

বাংলাদেশের পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে 'নির্যাতন' ব্যপকভাবে 'থার্ড ডিগ্রী মেথড' হিসেবে অভিহিত। প্রত্যাশিত 'পাওনা' ঠিকমত পাওয়া না গেলে তদন্তকারী কর্মকর্তা বহুল প্রচলিত হিংশ্র নির্যাতনের হরেক রকম সংমিশ্রন ঘটিয়ে এই 'থার্ড ডিগ্রী মেথড' প্রয়োগ করবে, যা- লোকটির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। এই 'মেথড' এর মধ্যে নির্যাতনের অসংখ্য নির্মম পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল, লাঠি বা ভোতা কিছু দিয়ে পায়ের তলায় ও শরীরের স্পর্শকাতর অংশে আঘাত করা; বুট পায়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাড়ানো; শীত ও গ্রীষ্মকালে মরিচের গুড়া মিশিয়ে যথাক্রমে ঠান্ডা ও গরম পানি নাকে-মুখে ঢেলে দেওয়া; বৈদ্যুতিক শক দেওয়া; আঙুলের নখ উপড়ে ফেলা; সূঁচ বা কাঁটা ফোঁটানো; যৌন পীড়ন চালানো প্রভৃতি। জোর পূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়, শাস্তি দেওয়া, অর্থ আদায় এবং উর্ধতন কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করতে এই 'থার্ড ডিগ্রী মেথড' ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশ বর্তমানে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হলেও নির্যাতিত মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া তথা চরম মানবাধিকার লংঘন প্রতিকারে ও প্রতিরোধে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। কাউন্সিলে গ্রহনযোগ্যতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে জরুরী ভিত্তিতে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে হবে নতুবা এ পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। আসন্ন মাসগুলোতে দেশটিতে নির্যাতিতদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষমতার বিষয়ঃ যেমন, নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনের ১৪ এর ১ অনুচ্ছেদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা (রিজার্ভেশন) প্রত্যাহার করা; নির্যাতন স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা; 'নির্যাতন'কে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পন্থায় 'অপরাধ' হিসেবে গণ্য করে আইন কার্যকর করা; কোন সময় ক্ষেপণ না করে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক দপ্তর কর্তৃক নির্যাতন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন; ইনডেমনিটি এ্যাক্ট-২০০৩ এবং ফৌজদারী কার্যবিধি'র ১৩২ ও ১৯৭ ধারা সহ রাষ্ট্রীয় নির্যাতনকারীদের দায়মুক্তি দেওয়ার আইনগুলো বাতিল করা; দূর্নীতির সকল অভিযোগের তদন্ত ও বিচার করা; নির্যাতিত মানুষকে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া; আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানের সাথে সঙ্গতি রেখে সকল অভিযুক্ত নির্যাতনকারীকে স্বাধীন ও কার্যকর তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার নিশ্চিত করা; এবং নির্যাতিত মানুষ ও সাক্ষীদের কার্যকর নিরাপত্তা দেওয়া, প্রভৃতি কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে মুল্যায়ণ করতে হবে।

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন বাংলাদেশে নির্যাতিতদের নিরাপত্তা প্রদানে সব ধরণের অপপ্রয়োগ এবং নির্যাতনের সংস্কৃতির প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং সরকারকে তার এ বিষয়ক অঙ্গীকারসমূহ স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য, বিশেষ করে উপরের সুপারিশগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে গ্রহনযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের আহবান জানাচ্ছে। এতে সরকারের তরফ থেকে ব্যর্থতা তাদের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিন্দা এবং মানবাধিকার কাউন্সিল থেকে বহিস্কারের ব্যবস্থাই শুধু করবে। নির্যাতিতদের সমর্থনে জাতিসংঘভুক্ত সদস্যরা ঘটা করে শুধুই একটি দিবস উদযাপনের বাইরে যদি গ্রহনযোগ্য কিছু করতেই চায়, তবে চরম এই অমানবিক মৌলিক ও মানবাধিকার লংঘনের সত্যিকার প্রতিকারের কঠোর পদক্ষেপ নিতেই হবে।